Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.01

মার্কসবাদ ও তার সমকালীন পর্যালোচনা

সন্তোষ কুমার পাল
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

যদিও মার্কস বিগত শতাব্দীর সব থেকে প্রভাবশালী বক্তিত্ব তথা সমাজতাত্ত্বিক [না, আমার কথা নয়, বি বি সি-র সমীক্ষা!] তথাপি তাঁর সমাজ-দর্শনকে সব থেকে ভুল বোঝা হয়েছে (এবং এখনও হয়)। না পড়ে সমালোচনার মানুষজনও অনেক আছেন। ‘যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা’ ধরনের সমালোচনাও আছে। সঙ্গে আছে (দার্শনিক কান্টের ভাষা ধার করে বলি) “সেলফ-ইনকারড ইমম্যাচিউরিটি’। দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে এবং দর্শনের শিক্ষক হিসেবে আমার মনে হয়েছে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বহনকারী এই সমাজ-দর্শনকে বাঙালির কাছে আর একবার তুলে ধরা দরকার। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা ও সর্বশেষ তথ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি এই কাজটিই করতে চেষ্টা করছি বর্তমান প্রবন্ধে।

কথামুখ

মার্কসবাদ আমাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক গতিশীল সমাজবিজ্ঞান ও ফলমুখী দর্শন তথা মতাদর্শ যা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি-প্রকরণের মাধ্যমে বস্তুজগত তথা মানব-সমাজের বিকাশের ধারা তথা নিয়ম-নীতিগুলি আবিষ্কার করে এবং তার ভিত্তিতে সমাজ-পরিবর্তনের প্রস্তাব করে। কার্ল হাইনরিখ মার্কস (Karl Heinrich Marx) [১৮১৮-৮৩] নিজে ‘মার্কসবাদ’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। মার্কসের বন্ধু তথা সহকর্মী ফ্রেডেরিখ এঙ্গলস্ (Friedrich Engels) [১৮২০-১৮৯৫] মার্কসের মৃত্যুর পর প্রথম ‘মার্কসবাদ’ শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (Vladimir Ilyich Lenin) [১৮৭০-১৯২৪] মার্কসবাদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেন। ‘সেকেণ্ড ইন্টারন্যাশনাল’ (১৮৮৯-১৯১৬)-র পর থেকে মার্কসবাদকে এক সংহত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক চেহারা দেওয়া শুরু হয়। গেয়র্গি প্লেখানভ ১৮৯৪ সালে মার্কসবাদকে ‘একটি সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষা’ রূপে উল্লেখ করেন।

মার্কস প্রাথমিকভাবে বৈপ্লবিক প্রোলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy)-র সমালোচনায় মনোযোগী হন, এবং একই সঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তক হিসেবে নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান সংহতকরণের চেষ্টা করেন। মার্কসের বস্তুবাদী চিন্তাধারা কীভাবে পণ্যের উৎপাদন সংঘটিত হয় এবং তার মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সম্পর্কগুলি (relations of production) কীভাবে ক্রিয়া করে এবং তা কীভাবে রাজনৈতিক সংঘ বা দল তথা রাষ্ট্র, এবং তৎকালীন চিন্তার জগতকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে-এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। এই বস্তুবাদ

আধিবিদ্যক বা সত্তাতাত্ত্বিক কোন ধারণা নয় (not metaphysical materialism), বরং একে আমরা বলতে পারি পদ্ধতিতাত্ত্বিক বস্তুবাদ (methodological materialism), যা অতিপ্রাকৃত বা নিছক আধিবিদ্যক ধারণার ভাষায় মানবসমাজের ঘটনাক্রম তথা পরিবর্তনকে বুঝতে চেষ্টা করেনা, বরং বাস্তব পরিস্থিতি ও মানুষের সক্রিয়তার মাধ্যমে তাকে ব্যাখ্যা করে। লুডভিগ ফয়েরবাখের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মার্কস প্রভাবিত, তবে তিনি তাঁর অভিমতের যান্ত্রিকতাকে বর্জন করেছেন। অন্য দিকে, মার্কসের অবস্থান হেগেলের সেই ভাববাদের বিরুদ্ধে, যা নিছক চেতনার জগতে পরিবর্তনের মধ্যেই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্র খোঁজে। একই সঙ্গে প্রকৃতিজগত সম্বন্ধে ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব মার্কসের চিন্তাজগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ডারউইনের প্রকৃতিজগতের বিবর্তনের তত্ত্ব ও হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবনা থেকেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (dialectical materialism)-এর পদ্ধতিতত্ত্ব সূত্রবদ্ধ হয়েছে। এই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি যখন মানব সমাজের বিকাশকে বোঝার জন্য সূত্রবদ্ধ হয় তখন তা নূতন পরিচয় লাভ করে, যাকে আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism) বলি। এসব একত্রে বিচারে রেখে আমরা বলতে পারি, মার্কসবাদ এক সংহত প্রগতিশীল দর্শন যা উন্নততর সমাজের দিকে পরিবর্তনে ধারণাগত, পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক উপকরণ সরবরাহ করে, তার বাস্তবায়নের রাস্তা দেখায়। একাধারে প্রাকৃতিক জগত, মনুষ্য সমাজ ও আমাদের চিন্তার গতি তথা বিকাশকে ব্যাখ্যা করে। মার্কসের বিখ্যাত মন্তব্য: “এ পর্যন্ত দার্শনিকেরা জগতকে কেবল ব্যাখ্যা করে দায়িত্ব সেরেছেন, কিন্তু মূল প্রশ্ন হল, উন্নততর সমাজের লক্ষ্যে পরিবর্তন সাধন।” (“The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.”)। বলা বাহুল্য, মার্কসবাদ আলোকায়িত উদারনীতিবাদের যে ঐতিহ্য তারই এক উন্নততর রূপ, যা শোষণ ও বৈষম্য সম্পর্কে উদারনীতিবাদের যে অবজ্ঞা তা কাটিয়ে উঠেছে এবং এভাবে শোষণ ও বৈষম্যকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে স্থাপন করে তা এক বৈপ্লবিক ও ফলমুখী সমাজ-বিজ্ঞান তথা জগদ্বীক্ষায় স্থিতিলাভ করেছে।

মার্কসবাদের উৎস

বলা পুনরুক্তি শোনাবে, মার্কসবাদ যদিও এক স্বতন্ত্র দর্শন তথা বাস্তবায়নযোগ্য মতাদর্শ, তথাপি এর সূত্রগুলি মার্কস সংগ্রহ করেছেন তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগত থেকেই। লেলিনের মতে, মার্কসবাদের প্রধান উৎস তিনটিঃ জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ অর্থনীতি এবং ফরাসি সমাজতন্ত্র। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, জে. জি. ফিকটে ও জর্জ উইলহেম্ হেগেলের ভাববাদী দর্শন, এবং একইসঙ্গে পিয়ের জোসেফ প্রুঁধো (Pierre Joseph Proudhon) এবং লুডভিগ ফয়েরবাখ্

(Ludwig Feuerbach)-এর বস্তুবাদী চিন্তাধারা মার্কসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্কস-এঙ্গেলস্ হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির যুক্তিতত্ত্বকে গ্রহণ করলেও তাঁর ভাববাদী দর্শনের ‘কুহেলিকা’কে বর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে, ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে গ্রহণ করেছেন তার যান্ত্রিকতাকে বাদ দিয়ে। ফয়েরবাখ যে বস্তুবাদের প্রচার করেছিলেন সেখানে প্রাথমিক বস্তুরাজিকে পরস্পর বিছিন্ন বিচার করা এবং বিষয়ী-স্বরূপ মানুষের সক্রিয়তাকে অবহেলা করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডামস্ স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (the labour theory of value) মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্য (surplus value)-এর তত্ত্বকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। আবার এতিয়েন ক্যাবে (Etienn Cabet)-র মতো ফরাসি কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের সাম্যবাদের তত্ত্ব মার্কস-এঙ্গলসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল, যদিও শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন না থাকায় এর সমালোচনাও করেছেন তাঁরা। একইরকমভাবে স্যাঁ সিমো, চার্লস ফুরিয়ের ও রবার্ট ওয়েনের কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে বিচারে রেখেছেন, যদিও এর কল্পনা-বিলাসের সমালোচনা করেই।

মার্কসবাদের মূলতত্ত্বসমূহ

মার্কসবাদ এক সমগ্রতাবাদী দর্শন, যা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের বাস্তবসম্মত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে, মানবমাজের বিকাশের ধারাকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে চায়, কোনপ্রকার অতিপ্রাকৃত সত্তা বা কল্পকথার উল্লেখ না করে, বা অপরিবর্তনীয় সত্তা বা একগুচ্ছ ভাবকল্পের আশ্রয় না নিয়ে। যাই হোক, মার্কসবাদের কয়েকটি মূল সূত্র বা তত্ত্ব আছে, যদিও সেগুলো পরস্পর সম্পর্কিত: ক. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism), খ. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism), বা অন্য ভাষায়, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history), গ. ভিত্তি এবং উপরিসৌধ (Base and Superstructure), ঘ. উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (theory of Surplus Value), ঙ. বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব (theory of Alienation), চ. শ্রেণি ও শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব (class and class struggle), ছ. সমাজ-বিপ্লবের (theory of Revolution) জ. রাষ্ট্রসম্পর্কিত তত্ত্ব (theory of State) – এই কয়েকটি মূল ধারণা তথা নিয়মনীতির উপর মার্কসবাদ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করব।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

মার্কসবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিমূলক তত্ত্ব তথা পদ্ধতি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এর উপর ভিত্তি করেই মার্কসবাদের ইমারত গড়ে উঠেছে। অন্যভাবে বললে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার মূল ভিত্তি। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আসলে বস্তুবাদ (materialism) এবং দ্বন্দ্বতত্ত্ব (dialectics) এই দুইয়ের সমন্বয়। বস্তুবাদ এখানে বস্তুর প্রতি, জগতের প্রতি আমাদের

দৃষ্টিভঙ্গির সূচক। আর দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল বস্তুজগতের ঘটনা-প্রবাহের বিশ্লেষণ তথা ব্যাখ্যার পদ্ধতি। আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিজ্ঞানের সফল উদ্বোধন মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার সূচনাবিন্দু। যাই হোক, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তাই দুটি দিক রয়েছে এবং এই দুটি দিক পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে - দার্শনিক দিক (philosophical aspect) এবং পদ্ধতিগত দিক (methodological aspect)।

দার্শনিক দিক: দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ভাববাদের (idealism) বিপরীত। ভাববাদ আমাদের মনের ধারণা, কোন অতিপ্রাকৃত সত্তা (যেমন, হেগেলের 'দ্য অ্যাবসোলিউট'), বা ঈশ্বরতত্ত্বের ভাষায় জগত তথা সমাজের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে। ভাববাদের এহেন কাল্পনিক তথা ধারণাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে মার্কসবাদ জগৎ তথা মানব-সমাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। এখানে বস্তুবাদ বলতে মার্কসবাদীরা যান্ত্রিক বা রূপান্তরবাদী আধিবিদ্যক বস্তুবাদকে বোঝেন নি। এখানে 'বস্তুবাদ' শব্দে গতিশীল বস্তু (matter-in-motion)-কে প্রাথমিক, এবং সেই বস্তু সম্পর্কে ধারণা বা ভাবকে গৌণ ও বিমূর্ত বলে গণনা করা হয়েছে। মার্কসবাদের স্পষ্ট বক্তব্যঃ ক. প্রকৃতিগত কারণেই এই জগত বস্তুময়, যে বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত গতি (motion) আছে। প্রতিটি বস্তুর উৎপত্তির পিছনে থাকে বাস্তব কারণ এবং প্রতিটি বস্তুর উদ্ভব ও বিকাশ প্রকৃতির গতির সাধারণ নিয়মে ঘটে। খ. মনের বাইরে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এদের ধারণাগুলি মনোজগতের বিষয়। গ. জগত ও তার বিকাশের নিয়ম সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে। সর্ববিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে মানুষ এখন সক্ষম না হলেও তার জ্ঞানের পরিধি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং তা হতে থাকবে। জ্ঞান অর্জনের এই রাস্তা বাদ দিয়ে সত্যকে জানার অন্য কোন উপায় বা পদ্ধতি নেই, কোন শর্টকাট নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদ বস্তুবাদের গভীর তাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক আলোচনার চেয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদ তথা দ্বন্দ্বতত্ত্বকে গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী।

পদ্ধতিগত দিক: প্রকৃতিজগৎ তথা সমাজজীবনের পরিবর্তন তথা বিকাশের ধারণাকে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্কসবাদ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (dialectics) অনুসরণ করে। সক্রেটিস সহ গ্রীক দার্শনিকরা মনে করতেন যে বিভিন্ন ব্যক্তির অসংলগ্ন, কখনো বা পরস্পর বিপরীত বক্তব্য তথা যুক্তি খণ্ডনের মাধ্যমেই কোন বিষয় সম্পর্কে সত্যে পৌঁছানো যায়। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকেই পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর দর্শনে প্রয়োগ করেন। চরম ভাববাদী দার্শনিক হেগেল কীভাবে চিন্তাভাবনার জগতে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে পরিবর্তন, বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হেগেলীয় এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল, তিনি কেবল চিন্তা বা ভাবের জগতেই এই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন, চরম ভাব বা সত্তার (the

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.01

Absolute) ক্রমবিকাশ হিসেবে সব রূপান্তরকে বুঝেছেন। আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার জগতকে তথা বস্তুজগতকে তিনি অবহেলা করেছেন। মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভাববাদী খোলসকে বর্জন করে তার যুক্তিনিষ্ঠ সারবত্তাকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মার্কসের মন্তব্য: "My dialectic is not only different from the Hegelian, but is its direct opposite...With him it is standing on its head. It must be turned right side up again, if you would discover the rational kernel within the mystical shell." (“আফটারওয়ার্ড” টু দ্য সেকেণ্ড এডিশন অফ “ক্যাপিটাল”)।

যাই হোক, স্তালিনকে অনুসরণ করে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমার এখানে বলতে পারি: ১. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে, প্রকৃতির কোন বস্তু বা ঘটনাকে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে কোন ঘটনাকে তৎকালীন স্থান-কাল-পাত্র মধ্যে রেখেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রতিটি বস্তুই গতিশীল, এবং তাই বস্তুকে বিচার করতে হবে তার গতিশীলতার মানদন্ডেই। প্রকৃতিক জগতে প্রতিনিয়তই যেমন নতুন নতুন বস্তু জন্মগ্রহণ করছে, তেমনি আবার পুরাতন বস্তুর ধ্বংস ঘটছে। দ্বন্দ্ব-পদ্ধতি বস্তুর জন্ম, বিকাশ ও ধ্বংস সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও এই পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করে বিকাশমান বস্তুর বা শক্তির উপর। ২. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই পদ্ধতি মানব-সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহৃত হয় তখন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। যাই হোক এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের কথা মার্কস-এঙ্গেলস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

১. **পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের নিয়ম** (the law of transformation of quantity into quality): দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই নিয়ম বলতে চায়, পরস্পর বিপরীতধর্মী বস্তু তথা শক্তিগুলির দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমবর্ধমান পরিমাণগত পরিবর্তন একসময় গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করে। পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছালে এক আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জলের উত্তাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে জল একসময় বাষ্পে পরিণত হয়। আবার একই জল ঠাণ্ডা হতে হতে একসময় জমে বরফ হয়ে ওঠে। সমাজ বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একপর্যায়ে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার মধ্যে দিয়ে পরিমাণগত পার্থক্য গুণগত পার্থক্যে রূপান্তরিত হয়, ঠিক যেমন আমরা আশা করছি আজকের পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রে উত্তরিত হবে একদিন।

২. **বিপরীতের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের নিয়ম** (the law of unity and struggle of the opposites): দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর-বিপরীত বা পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য থাকে; তথাপি তারা এক ভার সাম্যের পরিস্থিতি তৈরি করে। কিন্তু স্বীয় আধারে ক্রিয়াশীল এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে অনুকূল পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। আসলে প্রতিটি বস্তু

বা ঘটনার দুটি দিক: একটি ঋণাত্মক (negative), অপরটি ধনাত্মক (positive)। একটি তার অতীত, একটি তার ভবিষ্যৎ, একটি বিনাশের দিক, অপরটি বিকাশের দিক – এই অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা থেকেই যাবতীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়। সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে তাই আমরা লক্ষ্য করি, পুরনো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজের অভ্যুদয়। মার্কসবাদ তাই বিশ্বাস করে যে বর্তমান সমাজের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যেকার শ্রেণি-দ্বন্দ্বের ফলেই একদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে। যাই হোক, মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বে প্রধানত দুই ধরনের দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়: বৈর দ্বন্দ্ব (antagonistic conflict) ও অ-বৈর দ্বন্দ্ব (non-antagonistic conflict)। সমাজের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির সম্পর্ক থেকে বৈর দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব হলো বৈর দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষক-শোষিতের অস্তিত্ব না থাকায় বৈর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলেও সেখানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, নারী-পুরুষের লিঙ্গ-সমতাগত দ্বন্দ্ব, মানসিক ও কায়িক শ্রমের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থেকে যেতে পারে। এইরূপ দ্বন্দ্বকে অ-বৈর দ্বন্দ্ব বলে। সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার পরবর্তী পর্যায়ে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এরূপ অ-বৈর দ্বন্দ্বেরও অবসান হবে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো: আধুনিক বুর্জোয়া ভাববাদী দার্শনিকরা বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন না, মনে করেন, আমাদের চিন্তা বা ধারণা (thought)-ই কেবল স্ববিরোধী বা অসংগতিপূর্ণ হতে পারে, যেখানে বস্তুরাজি সম্পর্কে এইরূপ দ্বন্দ্বের কথা বলা নিরর্থক।

৩. **অস্বীকৃতির অস্বীকৃতির নিয়ম** (the law of negation of the negation): দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে পুরাতনের অস্বীকৃতি ছাড়া নতুনের আবির্ভাব ঘটতে পারে না। নতুন ক্রমে পুরনো হয়, তখন আরো বদল ঘটে। তবে নতুন ব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নততর হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিন্তার ইতিহাসে একেবারে প্রথম দিককার আদিম প্রাকৃতিক বস্তুবাদের অস্বীকৃতি ঘটেছিল ভাববাদের দ্বারা। প্রকৃতির ভয়াল রূপকে বুঝতে না পেরে একাধিক দেবদেবীর কল্পনা করেছে। আবার সেই ভাববাদের অস্বীকৃতির উপর আধুনিক বস্তুবাদের জন্ম। এক্ষেত্রে আধুনিক বস্তুবাদ হল অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি। এই প্রক্রিয়াকে বাদ (thesis), প্রতিবাদ (antithesis) এবং সম্বাদ (synthesis)-এই ত্রিমাত্রিক সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। থিসিস-আন্টিথিসিস-সিন্থেসিস এই ত্রিত্বকে সাধারণভাবে হেগেলের আবিষ্কার বলে প্রচার করা হয়। প্রকৃত তথ্য হল জি জে ফিক্টে প্রথম এই ত্রিমাত্রিক সূত্রের মাধ্যমে পরিবর্তনকে বাখ্যা করেন। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে ‘বাদ’ ধরলে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধকে ‘প্রতিবাদ’ ধরতে হবে। এই দুইয়ের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র রূপ ‘সম্বাদ’-এর সৃষ্টি হয়। এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, বিষয় বা ঘটনাকে যদি তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও বিরোধের পটভূমিতে, তাদের অগ্রগতির প্রবাহে, পরিণামের গুণে রূপান্তরে এবং স্ববিরোধী ও অন্তর্দ্বন্দ্বের

সমগ্র প্রক্রিয়ার আলোকে বিচার করা হয়, তবেই আমরা অনেক বেশি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাবো।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

মানুষের ও মানব সমাজের বিকাশের যে ধারা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। এই বস্তুবাদ কেবল সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অতীত ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করেই তার কর্তব্য শেষ করে না, সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সমাজ কেমন হবে তারও ইঙ্গিত দেয়। এঙ্গেলস্ বলেছেন, ডারউইন যেমন প্রকৃতি তথা জীবজগতের পরিবর্তনের নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন, মার্কসও তেমনি মানব-ইতিহাসের বিকাশের সূত্রগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, "Just as Darwin discovered the laws of development of organic nature, so Marx discovered the laws of development of human history."। যাই হোক, মানব সমাজের প্রকৃত ইতিহাস হল সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশ ও পরিবর্তনের ইতিহাস। বাঁচার জন্য মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, উৎপাদনের উপকরণ ইত্যাদি। এইসব বাস্তব প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য মানুষকে উৎপাদন-কার্যে অংশগ্রহণ করতে হয়। এইসব উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধতির উপর সমাজের দৈনন্দিন বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্ভরশীল। আবার সমাজের বিকাশ তথা পরিবর্তনের মুখ্য কারণ একনিষ্ঠ উৎপাদনশক্তি (forces of production), উৎপাদনের উপকরণ (means of production) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production)-এর মধ্যেকার নানাবিধ দ্বন্দ্ব। বস্তুত মার্কস উৎপাদনের উপকরণ (means of production) এবং শ্রমশক্তি (labour prower) উভয়কেই উৎপাদন-শক্তি হিসেবে গণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, উৎপাদন বলতে বোঝায় প্রাকৃত বস্তু ও শক্তির উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে বৈষয়িক তথা ভোগ্যবস্তু তৈরি করার প্রক্রিয়া। এই উৎপাদনের উৎপাদন মূলত দুটি--প্রকৃতি ও মানুষের শ্রমশক্তি। উৎপাদন বলতে এখানে সামাজিক উৎপাদনকে বুঝতে হবে, কেননা আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় সব ভোগ্যবস্তু বা পণ্য উৎপাদন করা অসম্ভব। আবার এই উৎপাদন-পদ্ধতির (mode of production) দুটি দিক: যথা, উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক। শ্রমিকের শ্রম (labour), আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি হল উৎপাদন-শক্তি। উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত মানুষজন, তথা শ্রেণিতে শ্রেণিতে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকেই বোঝায়। মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সংগতি থাকলেই উৎপাদন কার্য স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে। তবে উৎপাদন-শক্তির উন্নতি ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সাধিত হলে উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে তার সঙ্গতি

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.01

বিনষ্ট হয়, এবং উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মার্কস-এঙ্গেলস্ মন্তব্য করেছেন, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া এতাবৎকাল যত সমাজ দেখা গেছে তাদের প্রতিটিতেই দুটি প্রধান শ্রেণির দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। আদিম যৌথ সমাজে উৎপাদনের শক্তি তথা উপকরণগুলির (means of production)-র উপর ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় সমাজে শ্রেণি-শোষণ ছিল না। পরবর্তীকালে দাস-সমাজ ব্যবস্থায় (slave society) দাস-মালিকেরা উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম করে। ক্রমান্বয়ে সামন্তব্যবস্থায় (feudalism) উৎপাদনের উপকরণের মালিক হল সমান্ত-প্রভুরা। যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটলে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে এবং আজকের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার (capitalism) সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির মালিক অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব ক্রমে তীব্রতর হয় এবং বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের (socialism) আবির্ভাব ঘটে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সবরকম শোষণের অবসান ঘটে। এভাবে মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে সমাজবিকাশের ধারার ব্যাখ্যা দেন।

ভিত্তি এবং উপরিসৌধ

এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল, ভিত্তি (base) এবং উপরিসৌধ (superstructure)-র তত্ত্ব। মার্কস মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে বড় কোন ভাব বা দর্শন নয়, অর্থনীতিই হল সমাজের মূল ভিত্তি (base)। আর এসব ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে থাকে ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, আইন বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেগুলি সমাজের উপরিকাঠামো (superstructure) তৈরি করে। উপরিকাঠামোর এই উপকরণ ও প্রতিষ্ঠান অর্থনীতির মূল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে শুধু তাই নয়, তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে উপরিকাঠামো সবসময় সব ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভিত্তির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, বা অর্থনীতিই সবকিছু নির্ধারক (যাকে পরিভাষায় 'economic dterminism' বলা হয়!)। মার্কসবাদীরা স্পষ্টত উপরিকাঠামোর আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। [এখানে পূর্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ (pre-determinism) এবং নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism) - এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, আর প্রথমটিকে নিয়তিবাদ ও দ্বিতীয়টিকে কে কার্য্য-কারণ অর্থে বুঝতে হবে।] এঙ্গেলস্ মন্তব্য করেছেন, যাঁরা আমাদের বক্তব্য কিছুটা বিকৃত করে এরকম বলেন যে, অর্থনৈতিক কারণই একমাত্র পরিবর্তনের কারণ, তখন তাঁরা আমাদের এই তত্ত্বকে অর্থহীন, বিমূর্ত ও অদ্ভূত করে তোলেন। অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ অবশ্যই ভিত্তি। কিন্তু উপরিসৌধের অন্যান্য উপাদান তথা শ্রেণি-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ ও তার ফলশ্রুতি, সংবিধান এবং আইনগত কাঠামো এবং

সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিসমূহ তথা দলের রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি - এই সমস্ত কিছুই সমাজ বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং বহুক্ষেত্রে তারা নির্ধারকের ভূমিকাও পালন করে। লুই আলথুজের, আন্তোনিও গ্রামশি প্রমুখ মার্কসবাদী চিন্তক উপরি-সৌধের গুরুত্ব বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যাই হোক, এ ব্যাপারে মার্কস অবশ্য মনে করেন, "It is not the consciousness of man that determines their existence, but, on the contrary, their social existence that determines their consciousness." ("এ কন্ট্রিবিউশন টু 'দ্য ক্রিটিক অফ্ পলিটিক্যাল ইকোনমি")। হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁরা বলেন, আমাদের প্রতিদিনকার গতিবিধি ক্রিয়াকর্মের যে সামাজিক অস্তিত্ব তাই-ই আমাদের বিচার-ধারা তথা চৈতন্যকে নিরূপণ করে। যে বাস্তব সমাজ, যে অর্থনীতি, যে বৌদ্ধিক পরিবেশে আমরা বাস করি তার ভিতর দিয়েই আমাদের চেতনা গঠিত হয়, বিপরীতভাবে নয়। ভাববাদীরা এরকম ভাবতে অভ্যস্ত যে আমাদের চিন্তা-চেতনাই আমাদের সামাজিক অস্তিত্বকে নিরূপণ করে। মার্কসবাদীরা জোরের সাথে বলেন, আমাদের বিশেষ সামাজিক অবস্থানই আমার চিন্তা-চেতনা ও বিচারধারাকে গড়ে তোলে।

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (theory of Surplus Value)

মার্কসবাদের অন্যতম (সব থেকে বেশি!) গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে কীভাবে শ্রম-শোষণ চলে তার প্রকৃত, নির্ভেজাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই তত্ত্বে। মার্কসের মতে, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের সমন্বয়ে যে পণ্য উৎপন্ন হয় তার প্রায় সবটাই মানুষের শ্রমের ফল। পুঁজিবাদী সমাজে কারখানার মালিক পুঁজিপতিই উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণগুলির মালিক হয়, এই কারণে শ্রমজীবী মানুষ জীবনধারণের জন্য তাদের কাছে শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শ্রমশক্তির মূল্যের পরিমাণ এবং শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রমিক যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে তা কখনোই সমান সমান হয় না। প্রসঙ্গত, নিজের মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করতে শ্রমিক যেটুকু সময় কাজ করে সেই সময়কে বলা হয় আবশ্যিক শ্রম-সময়। পুঁজিপতির অধীনে না থেকে সেই শ্রমিক যদি নিজের উপকরণ ব্যবহার করে খুশিমতো কাজ করতো তাহলে তাকে এইটুকু সময়েই কাজ করতে হতো। তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হলে যে মূল্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন তার জন্য তাকে ঐ শ্রমটুকু অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু পুঁজিপতির অধীনে কাজ করলে সে যে মূল্য সৃষ্টি করে তার বেশ কিছুটার জন্য সে কোন পারিশ্রমিক পায় না। কোনরূপ পারিশ্রমিক না পেয়ে কেবল পুঁজিপ্রতির জন্য উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করতে শ্রমিক যতখানি বাড়তি সময় কাজ করতে বাধ্য হয় তাকেই উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বলা হয়। মূল ব্যাপারটি তাহলে এরকম দাঁড়ায়: মোট শ্রম-সময়ে সৃষ্ট পণ্যমূল্য - মোট শ্রম-সময়ের মজুরি = উদ্বৃত্তমূল্য। জুতো কারখানায় উৎপাদনের একটি সহজ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.01

বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ধরে নিই, জুতো কারখানার মালিকের, একটি বড় ঘর, একটি জুতো সেলাইয়ের যন্ত্র, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ছোটখাট যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। আর তাকে রাখতে হবে একাধিক শ্রমিক যারা জুতো তৈরীর কাজটা ঠিকঠাক করতে পারে। জোগাড় করতে হবে কাঁচামাল, এখানে চামড়া। ধরা যাক, তৈরি করা একজোড়া জুতো বাজারে ২০০ টাকায় বিক্রি হয়। কারখানার মালিককে ঘর ভাড়া দিতে হয়, সেলাই কল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিনতে খরচ করতে হয়। কিন্তু এইসবকিছু এক জোড়া জুতো তৈরির পরেই ভেঙে পড়বে না বা নিঃশেষ হয়ে যাবে না, বহুদিন ধরে এগুলির ব্যবহার করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে এসব উপকরণের মোট আয়ু ধরে নিয়ে প্রতি জোড়া জুতো তৈরি করতে যতটুকু সেগুলির ক্ষয় হচ্ছে তার হিসাব মূল্য গণনায় ধরতে হবে। এখন, একজোড়া জুতো তৈরি করতে যে চামড়া লাগবে তার দাম ধরে নিই ১০০ টাকা। উপাদানের উপকরণের ক্ষয়-ক্ষতির মূল্য (depreciation value) ২৫ টাকা, আর প্রতি জোড়া জুতো তৈরি করে দেওয়ার জন্য শ্রমিকের (এখানে চর্মকার) মজুরি যদি ৫০ টাকা হয় তাহলে জুতো জোড়া তৈরিতে মোট খরচ হবে (১০০+২৫+৫০) টাকা, অর্থাৎ ১৭৫ টাকা। এখন একজোড়া জুতো বিক্রি করে যদি ১৭৫ টাকাই যদি পাওয়া যেত তাহলে কারখানার মালিক জুতো তৈরির ব্যবসা করত না। এখন জুতো জোড়া ২০০ টাকায় বিক্রি করায় তার জোড়া ২৫ টাকা বাড়তি থাকছে। এই বাড়তি অর্থমূল্য কিভাবে সৃষ্টি হল? চামড়ার জন্য ১০০ টাকা, উৎপাদনের উপকরণগুলির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২৫ টাকা, অর্থাৎ মোট ১২৫ টাকাকে এক জোড়া জুতো তৈরির মাধ্যমে ২০০ টাকায় পরিণত করছে চর্মকারের শ্রম। চর্মকার পাচ্ছে ৫০ টাকা। চর্মকার মূল্য সৃষ্টি করছে ৭৫ টাকা, আর মালিক সব খরচখরচা বাদ দিয়ে নিজে পাচ্ছে ২৫ টাকা। বলা বাহুল্য, জুতো-কারখানার মালিক এভাবে চর্মকারের শ্রম-ক্ষমতা কিনে উৎপাদনে ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করছে।

এইভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি মুনাফার পাহাড় জমায়, শ্রমিক শোষিত হতেই থাকে। একসময় কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিপতির এই কৌশল বুঝে উঠতে সক্ষম হয়। শোষিত বিক্ষুব্ধ শ্রমিক তখন শুরু করে সকলে মিলে এক হওয়ার, ডাক দেয় দল গঠনের, যার শেষ পরিণতি শ্রেণি-সংগ্রামে, যা একদিকে সর্বহারা শ্রমিকদের উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক হবার দিকে এগিয়ে দেবে। রাষ্ট্র-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সমাজতন্ত্রের সূচনা করবে।

অনন্বয় বা বিযুক্তি তত্ত্ব (theory of Alienation)

মার্কসবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হলো বিযুক্তি বা অনন্বয় তত্ত্ব। ‘alienation’ শব্দটি মার্কসীয় ব্যঞ্জনা প্রচলিত ‘বিচ্ছিন্নতা’ শব্দটির মধ্যে সবটুকু ফুটে ওঠে না। তাই উৎকৃষ্টতর পরিভাষা হিসেবে’ ‘অনন্বয়’ শব্দটি আমরা ব্যবহার করছি। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বটি মার্কসীয় দর্শনের বিক্ষিপ্ত কোন চিন্তা প্রকরণ নয়। শোষণভিত্তিক সমাজের সঙ্গে অনন্বয়ের ব্যাপারটি

জড়িত। মার্কস কমবেশি চারটি লেখায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, এবং এই রচনাগুলি হল, ‘ইকোনমিক অ্যাণ্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুসক্রিপ্টস অফ্ ১৮৪৪’, ‘থীসেস অন্ ফুয়েরবাখ্’, ‘দ্য হোলি ফ্যামিলি’ এবং ‘দ্য জার্মান আইডিয়োলজি’। শোষণযুক্ত সমাজের বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ ও তার থেকে মানবসমাজকে মুক্তির পথ দেখানোই মার্কসবাদের মূল প্রকল্প। নানারূপ বহুস্তরীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই মানুষ এইসব বিচ্ছিন্নতার কবল থেকে মুক্তি হতে পারে।

এ ব্যাপারে মার্কস প্রধানত হেগেল ও ফয়েরবাখের দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সমালোচনার সুরে বলেন, হেগেলের অনন্বয়ের ধারণা বিমূর্ত চিন্তার অনন্বয় (alienation of Ideas) এবং স্বভাবতই বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তথা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কোথাও যে অনন্বয় আছে তা তাঁর ব্যাখ্যায় মূর্ততা পায় নি। ফয়েরবাখেরের সীমাবদ্ধতা ছিল অন্যত্র। তাঁর সমালোচনা করে মার্কস লিখেছেন যে,ফয়েরবাখ ধর্মচেতনার পরিমণ্ডলে মানুষের আত্ম-বিযুক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

যাই হোক, মার্কসের মতে অনন্বয় বা বিযুক্তি হল এমন এক অবস্থা যার ফলে ব্যক্তি নিজেকে, তার নিজের ক্রিয়াকর্মকেও অনাত্মীয় করে তোলে এবং যেখানে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। মার্কস দেখালেন, শ্রেণিভিত্তিক পুঁজিনির্ভর সমাজে মানুষ তার শ্রমকে বিক্রি করতে বাধ্য হয় নিজের দৈহিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আপন শ্রমকে সে নিজের শ্রম ভাবতে পারে না, তজ্জাত ফলকে নিজের করে নিতে পারে না। যে যতই পণ্য উৎপাদন করে ততই তার জীবনধারণের গ্লানি বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বেশি উৎপাদনের জন্য মালিক আরও চাপ দেয়। তবে পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত সমাজে অনন্বয়ের দুঃখ একা শ্রমিকদেরই বহন করতে হয় তা নয়, পুঁজিপতিদের জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটে। তবে উভয়ের অনুভবের মধ্যে পার্থক্য আছে। ‘দ্য হোলি ফ্যামিলি’-তে মার্কস তাই লিখেছেন যে শ্রমিক অনন্বয়-সঞ্জাত দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত। কিন্তু পুঁজিপতি তার দুঃখ সম্বন্ধে বেশিরভাগ সময় সচেতন থাকে না। (স্মর্তব্য: ‘রক্তকরবী’-র রাজার অবস্থা!) ইতিহাসের নিয়মে তার ধ্বংস যে অনিবার্য তাও সে বুঝতে পারে না। এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কস দেখাতে চাইলেন যে শোষণভিত্তিক সমাজ কখনো কোন ব্যক্তির যথার্থ স্ফূরণের আধার হতে পারে না। তাই এর নিরাকরণ প্রয়োজন, এবং এর জায়গায় নতুন সমাজের উদ্বোধন জরুরী, যেখানে প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের বিকাশের জন্য কাজ করে যাবে। একই সঙ্গে শোষকেরও নবজন্ম হবে, সেও প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে।

মার্কস বস্তুত চার ধরনের বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেনঃ ক. উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকের অনন্বয় (alienation from the process of production), খ. উৎপাদিত দ্রব্য থেকে অনন্বয় (alienation from the product), গ. অপর ব্যক্তি তথা সহশ্রমিক থেকে অনন্বয় (alienation from the other), এবং ঘ. আত্মস্বরূপ থেকে অনন্বয় (alienation from own self or species-nature)। আমরা সংক্ষেপে এর বিবরণ করব।

ক. পুঁজি-নির্দেশিত সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি মানুষ শ্রমিক রূপে কাজ করে। কিন্তু তার থেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করে না; কেননা এই কর্মযজ্ঞ তার প্রয়োজনে নয়, কেবল পুঁজির বিকাশের জন্য, যে পুঁজি পরোক্ষে তাকে আরো আরো করে বদ্ধ করে। অন্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করতে বাধ্য হয় বলে এই সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে সে বিচ্ছিন্নতা বোধ করে। তার ন্যূনতম স্তর (subsistence level)-এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে শ্রম দিতে সে বাধ্য হয়। তার ভালো লাগে না। এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যথার্থ জুড়তে পারে না, তাই তার বিযুক্তি-বোধ।

খ. পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিক যে পণ্য উৎপাদন করে তা তার নিজের জন্য নয়, নিজে তার মালিকও হতে পারে না। বরং ক্রমে ক্রমে তা যে পুঁজির পাহাড় তৈরি করে তা শেষমেষ তার বিরুদ্ধে যায়। মার্কস তাই মন্তব্য করেছেন, তাঁর ঘর্মাক্ত শ্রমে তৈরি হওয়া বস্তু "exists outside him, independently of him and alien to him... (as) hostile force." ('ইকোনমিক অ্যাণ্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুসক্রিপ্টস অফ্ ১৮৪৪')। ফলত, শ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্য থেকেও বিযুক্তবোধ করে।

গ. সে একই সঙ্গে সহকর্মী মানুষজন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। পুঁজির পাহাড়ের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার আবহে সে নিজেকে একাকী, অসহায় ভাবে। যে পুঁজিকে সে তিল তিল করে তৈরি করে চলেছে তাই-ই পুঁজিপতির প্রভুত্ব তথা নিয়ন্ত্রণকে আরো শক্তপোক্ত করে তোলে। শ্রমিকদের মধ্যে কৃত্রিম প্রতিযোগিতা তৈরি হয় পুঁজিপতিকে কে কত সস্তায় শ্রম বিক্রি করতে পারে। তার এহেন প্রতিযোগী না থাকলে সে তার শ্রমের একটু বাড়তি মূল্যের জন্য দর কষাকষি করতে পারত। এই পর্যায়ে প্রত্যেক শ্রমিক অপর শ্রমিককে নিজের অস্তিত্বের পথে বাধা বলে মনে করে। তাই অপরের থেকেও সে অনন্বয় তথা বিচ্ছিন্নতায় ভোগে।

ঘ. পুঁজির শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ব্যক্তি-শ্রমিক একঘেয়েমি কাজের অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যে সব কাজ করি, তা আত্মস্ফূরণের জন্য, সেই কাজ করে তৃপ্তি পাই। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই কাজ, এই শ্রম আত্মস্ফূরণধর্মী তো নয়ই, বরং তা বাধ্য-শ্রম। ফলত মানুষ নিজ প্রজাতির স্বীয় স্বরূপ, যা কর্মের অনুষ্ঠান এর মধ্যে দিয়ে পরিতৃপ্তি, সার্থকতা খোঁজে, তার কোন সুযোগ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দেয় না। মার্কস এই অবস্থার বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.01

"In tearing away from man the object of his production, therefore, estranged labor tears from him his *species-life*, his real objectivity as a member of the species and transforms his advantage over animals into the disadvantage that his inorganic body, nature, is taken from him." ('ইকোনমিক অ্যাণ্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুসক্রিপ্টস অফ্ ১৮৮৪')। এইভাবে অনন্বিত শ্রম সকল মানুষকে (পুঁজির মালিককেও) যেমন সামাজিক ব্যবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে তেমনি আত্মস্বরূপ থেকেও সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তার মানসিক বা আত্মিক অস্তিত্ব নেহাত টিকে থাকার দেহ-সর্বস্ব জীবন সংগ্রামে কাৎরাতে থাকে।

শ্রেণি ও শ্রেণি-সংগ্রাম (Class and Class Struggle)

মার্কসবাদীদের মতে, ইতিহাসে (আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদে) যত ধরনের সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণি বলতে একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহনকারী সমাজের এক একটি অংশ বা গোষ্ঠীকে বোঝায়। যেমন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের যে অংশ শ্রমদান করে তারাই শ্রমিক, তাদের সমষ্টিকে বলা হয় শ্রমিক শ্রেণি বা প্রলেতারিয়েত। অন্য একটি অংশ যারা উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক তাদের বলা হয় মালিক বা পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণি। লেলিনের বিচারে, শ্রেণি হল এমন সব জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পৃথক পৃথক অবস্থানের দরুণ যার ক্ষুদ্র একটি অংশ অন্য বৃহত্তর অংশের শ্রমের উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করতে পারে। তাই একজন ব্যক্তির সামাজিক শ্রেণি-পরিচয় তার অর্জিত অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে "the source of his income in the means of production"-এর উপর। এভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমরা দুটি মূল শ্রেণিকে দেখতে পাইঃ মালিক শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণি। পুঁজিপতিরা শ্রমিকের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে বলে প্রথমোক্ত শ্রেণিকে শোষক শ্রেণি ও দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণিকে শোষিত শ্রেণি বলে। অন্যভাবে শ্রেণির বিভাজন করতে গিয়ে মার্কসবাদীরা কখনও কখনও মুখ্য শ্রেণি ও গৌণ শ্রেণি এই দুই শ্রেণির কথা বলেছেন। যে দুটি শ্রেণি বাদ দিয়ে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে পারে না (যেমন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণি) মুখ্য শ্রেণি, অন্যান্যরা গৌণ শ্রেণি ভুক্ত।

যাই হোক, আদিম সাম্যবাদী সমাজে (primitive communism) কোনরকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি অস্তিত্ব না থাকায় সেই সমাজে কোন শ্রেণি-বিভেদ বা শ্রেণি-দ্বন্দ্বও ছিল না বলে ভাবা হয়। কিন্তু পরবর্তী সব সমাজে-দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ছিল বা আছে, কেননা এইসব ব্যবস্থায় এক শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণগুলি দখল করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি করে, আর অন্য শ্রেণির তাদের হাতে শোষিত হয়। দাস সমাজে (slave society) দাসেদের

উপর শোষণ-নিপীড়ন চালানোর জন্য দাস ও দাস-মালিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব একসময় তীব্র হয় এবং এর পরিণতিতে দাস-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। তার জায়গায় আসে সামন্ত ব্যবস্থা (feudalism), যে সমাজ দুটি মুখ্য শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ভূমিদাসেরা বিদ্রোহ করে এবং বিভিন্ন পৃথক পৃথক বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে সামন্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। আসে পুঁজিবাদ (capiatalism), যে সমাজে আবার পুঁজিপতি বুর্জোয়া এবং সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে স্বার্থের তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শ্রেণি-দ্বন্দ্ব তীব্র হলে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি সঙ্ঘবদ্ধভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্তরে সংগ্রাম চালাতে থাকে। মার্কসীয় মতে, এই শ্রেণি-সংগ্রামে পুঁজিপতি শ্রেণিকে সরিয়ে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং এভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রেণি-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, কিউবা প্রভৃতি দেশে সফল বিপ্লব এই মার্কসীয় শিক্ষাকে সপ্রমাণ করেছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকরা অনেক বেশি শ্রেণি-সচেতন হওয়ায় শ্রেণি-সংগ্রাম তীব্রতর হয়। তারা তিন ভাবে এই শ্রেণিসংগ্রাম চালাতে থাকে: অর্থনৈতিকভাবে (economically), মতাদর্শগতভাবে (ideologically), এবং রাজনৈতিকভাবে (politically)। তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম হলো পেশাগত ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণি ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিপতির উপর চাপ বাড়াতে থাকে। কিন্তু এই ধরনের অর্থনৈতিক সংগ্রামের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। যেমন পুঁজিপতি শ্রেণি কিছু দাবীদাওয়া মেনে নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে পারে। তাই একই সঙ্গে এরূপ অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথে সাথে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। এ গুরুদায়িত্ব সেই শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী অংশকেই দিতে হয়। গড়ে উঠে কমিউনিস্ট পার্টি। শোষিত শ্রেণি যাতে নিজেদের শ্রেণি গত অবস্থার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, শ্রমিক শ্রেণিকে চূড়ান্ত শ্রেণি-সচেতনতা দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সাথে মতাদর্শগত সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হয়। মতাদর্শগত সংগ্রামে নামতে হলে শ্রমিক শ্রেণিকে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সংহত করার কাজে নামতে হয়। এসবের জন্য মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত এক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয়। এই মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণিকে সহায়তা করে কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির এক ব্যাপক অংশ। যতদিন পর্যন্ত না পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলুপ্ত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণিকে ততদিন তীব্র শ্রেণি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। পুঁজিবাদের উপর চূড়ান্ত জয়লাভের পর শ্রমিক শ্রেণি নিজের পক্ষে রাষ্ট্র-কাঠামোকে চালনা করবে। পরিণামে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে, উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ শোষণমুক্ত হবে।

সমাজ বিপ্লবের তত্ত্ব (theory of Revolution)

অভ্যন্তরীণ ঘটনারাজির সংঘাতে কোন দেশের সরকার বা শাসন-ব্যবস্থায় আকস্মিক ও হিংসাত্মক পরিবর্তনকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা অনেক সময় বিপ্লব (revolution) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বিপ্লবের এই ধারণা মার্কসবাদ অনুমোদন করে না। মার্কসবাদীরা বিপ্লবকে এমন এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিচার করেন, যার ফলে তৎকালীন সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর এমন নির্ণায়ক পরিবর্তন ঘটে যেখানে এক (শাসক) শ্রেণি অন্য এক শ্রেণির দ্বারা অপসৃত হয়। এই নতুন শ্রেণির পুরাতন-ব্যবস্থার তুলনায় উন্নতর উৎপাদন-সম্পর্ক ও সামাজিক দিক থেকে প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করে।

যাই হোক,যখন কোন সমাজের উৎপাদন শক্তির (মূলত শ্রমশক্তি) সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বড় ধরনের বিরোধ দেখা দেয় তখন পুরনো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। এই বিপ্লব কখনো বুর্জোয়া বিপ্লবের চেহারা নেয়, কখনওবা তা প্রলেতারীয় বা সর্বহারার বিপ্লবের। ‘কমিউনিস্ট মেনোফিস্টো’-তে বলা হয়েছে উৎপাদন ও বিনিময়ের যেসব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলেছে, সেগুলির উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যেই নিহিত থাকে। উৎপাদন ও বিনিময়ের এসব উপায়ের বিকাশ এমন এক বিশেষ পর্যায়ে এসেছিল যা সামন্ত সমাজে উৎপাদন ও বিনিময় শর্ত, সামন্ত কৃষি ও হস্তশিল্প সংগঠন মালিক সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে খাপ খেলো না। এগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই শৃঙ্খল ভাঙতো এবং ভেঙেও ফেলা হলো। বলা বাহুল্য, শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা হলো বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি, ইতিহাসের প্রধান প্রধান বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে। এসব বুর্জোয়া বিপ্লবে বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং শ্রমিক শ্রেণি কখনো স্বেচ্ছায়, কখনও বা বাধ্য হয়ে তাদের অনুগমন করেছিল। এসব বিপ্লবের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি অধিকাংশ দেশে উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাকে এক সর্বজনীন চরিত্র দান করেছিল।

ইতিহাসের দিক থেকে এই বুর্জোয়ারা প্রগতিশীল ভূমিকা নিলেও পরবর্তী পর্যায়ে তারা প্রতিক্রিয়াশীলের ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে, শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকে। মার্কস-এঙ্গেলস্ তাই এই ধরনের বুর্জোয়া বিপ্লবের বিপরীতে প্রলেতারিয়েত তথা সর্বহারার বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করেন। প্রলেতারীয় বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা এবং এতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের কথা বলেন। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ

দেখা দিলে প্রলেতারিত বিপ্লব (যাকে মার্কস ইতিহাসের চালিকা-শক্তি বলেছেন) আসন্ন হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণি প্রতি-বিপ্লবী হয়ে ওঠে এবং তাই শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবের রাশ হাতে তুলে নিতে হয় এবং শ্রমিক শ্রেণির সাথে পুঁজির বিনাশের লক্ষে সর্বহারা বিপ্লবকে চালনা করতে হয়, যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি রাষ্ট্র-ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ দখল পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই বৈপ্লবিক আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে। এই সর্বহারা প্রলেতারিয় বিপ্লব শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক শাসন কায়েম করে। তারপর সেই রাজনৈতিক শক্তির সহায়তায় সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সমষ্টিগত সমাজতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। রাশিয়া, চীন, কিউবা প্রভৃতি দেশের বিপ্লব এই ধরনের সমাজ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঘটা এই বিপ্লবের দুই ধরনের শর্ত বা পরিস্থিতি থাকে-বিষয়গত পরিস্থিতি (objective conditions) এবং বিষয়ীগত পরিস্থিতি (subjective conditions) বিষয়গত পরিস্থিতিকে আবার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিও বলা হয়। এই প্রসঙ্গে লেলিন মূলত তিনটি অবস্থার কথা বলেছেনঃ ক. দেশের মধ্যে নানা প্রকার সমস্যা এমন চরম আকার ধারণ করে যে শাসক ও শোষক শ্রেণি কোনো না কোনো পরিবর্তন না করে তাদের শাসন চালু রাখতে পারে না। খ. শোষিত শ্রেণির দুঃখ-দারিদ্র্য তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে, এবং গ. এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ নানা ধরনের ঐতিহাসিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অন্য দিকে বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থা বলতে (ক) জনগণের বিপ্লবী চেতনা এবং সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি ও দৃঢ়তা, (খ) সংগঠিত গণশক্তির বিকাশ, যার ফলে জনগণের পক্ষে সর্বশক্তিতে বিপ্লবের শামিল হওয়া সম্ভব, এবং (গ) জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত এক কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টি অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের নির্ভুল রণনীতি এবং রণকৌশল নির্ণয় করতে ও তাকে বাস্তবিক রূপায়ণ করতে সক্ষম। তবে বিপ্লবের এই দুই প্রকার পরিস্থিতি তথা শর্তাবলির ঐক্য সাধন করা জরুরী। আর একটা কথা, একটি দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যেমন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সূচনা করে, তেমনি আবার বাহ্যিক দ্বন্দ্বও বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে উপনিবেশ সমূহের দ্বন্দ্বই হলো বাহ্যিক দ্বন্দ্ব।

বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরেকটি কথা: এই বিপ্লব হিংসাশ্রয়ী রক্তাক্ত হবে, নাকি অহিংস শান্তিপূর্ণ হবে তা নির্ভর করে শোষক শ্রেণির প্রতিক্রিয়ার উপর। লেলিন মন্তব্য করেছেন, “বিপ্লব হিংসা তাণ্ডবলীলা নয়, বরং উৎপীড়িত শোষিতের মহোৎসব”। শোষক শ্রেণি নিজেদের ভুল

বুঝতে পেরে যদি পুঁজি তথা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয় তাহলে রক্তপাতের কোনো প্রশ্নই থাকবে না!

রাষ্ট্রসম্পর্কিত তত্ত্ব (theory of State)

মার্কসবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতির কার্যাবলী সংক্রান্ত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের মতো রাষ্ট্রকে ‘একটি জীবন্ত প্রাণীদেহ’, ‘মানুষের প্রতিমূর্তি’ ইত্যাদি বলে, বা আদর্শবাদের মত ‘সর্বদেশ মুক্ত প্রজ্ঞা’, ‘চেতনার বস্তুগত রূপ’ বা ‘নৈর্বক্তিক শক্তি’, ‘সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশস্থল’ বা ‘ঈশ্বরের পদক্ষেপ’ বলে, অথবা বুর্জোয়া রাষ্ট্রদর্শনের মত রাষ্ট্রকে ‘জনকল্যাণ সাধনের জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান’ বলে মনে করে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। মার্কসবাদের মতে, আকস্মিকভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেনি। আবার সমাজবহির্ভূত কোন শক্তি দ্বারাও তার সৃষ্টি হয়নি। সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যভাবে বললে, অর্থনৈতিক বিকাশে একটি বিশেষ পর্যায়ে যখন অনিবার্যভাবে সমাজের শ্রেণি বিভাগের সৃষ্টি হল এবং একটি শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণিকে শোষণ করার ব্যবস্থা চালু হলো তখনই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, সমাজ ব্যবস্থার চারটি স্তরের মধ্যে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনরূপ অস্তিত্ব না থাকায় সমাজের শ্রেণি-শোষণের ব্যাপার ছিল না। এবং তাই শ্রেণি-শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন পড়েনি। পরবর্তী পর্যায়ে থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন, শ্রম বিভাগ ইত্যাদির কারণে সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এইসব ব্যবস্থাকে চালু রাখা এবং সমাজের কর্তৃত্বকারী অধীনে রাখার প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রের দরকার পড়ে। এঙ্গেলস্ বলেন, রাষ্ট্রের আবির্ভাব যেহেতু শ্রেণি-বিরোধকে যথাসম্ভব সংযত রাখা, নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে, সেহেতু তার উদ্ভব হয়েছে শ্রেণি-বিরোধ থেকেই। তাই রাষ্ট্র সাধারণভাবে শক্তিশালী প্রভুত্বকারী শ্রেণির দমনপীড়নের হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করে। দাস যুগে দাসেদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দাস-মালিকদের হাতিয়ার হিসেবে, সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাসেদের বশে রাখার জন্য এবং আধুনিক পুঁজিবাদে মজুরি-শ্রমে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্র ক্রিয়াশীল ছিল বা আছে।

তবে মার্কস মনে করেন, আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে: এতে শ্রেণি-বিরোধ স্পষ্ট ও সরল হয়ে এসেছে, সমগ্র সমাজ আড়াআড়িভাবে দুটি শ্রেণি-বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আইন, প্রশাসন, বিচারালয়, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, ইত্যাদির মাধ্যমেও বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণি রাষ্ট্রকে তাদের স্বার্থের অনুকূলে রাখতে সমর্থ হচ্ছে না।

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র আধুনিক এসব রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি আসলে পুঁজিপতি শ্রেণির সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনার একটি কমিটি মাত্র।

অবশ্য মার্ক্স যখন এসব লিখছেন তখন অবস্থা সরল ছিল। তবে একবিংশ শতাব্দীর আজকের যুগে এসব ব্যবস্থা আর এত সরল নেই। বিজ্ঞান প্রযুক্তি ধর্ম বিশ্বায়িত (ধান্দার) পুঁজি মিলেমিশে যাওয়ায় আজকের পুঁজিতন্ত্র অনেক নতুন নতুন মুখোশের আড়াল নিচ্ছে! আজকের পুঁজিবাদকে অনেকে 'ফাইনান্স ক্যাপটালিজম' বলে চিহ্নিত করছেন, যেখানে যেনতেন প্রকারেণ পুঁজির বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সত্যিকারের উৎপাদন নেই। সাবেকি পুঁজিবাদে প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকার ফলে মালিকের উৎপাদক শ্রমিকের প্রতি মিনিমাম একটা দায়িত্বের প্রশ্ন থাকে ও মানুষকে কম দামে পণ্য সরবরাহ করার চেষ্টা থাকে, ফাইনান্স ক্যাপটালিজমের সে দায়টুকু পর্যন্ত থাকে না। রাষ্ট্রের বিধি-নিষেধ উড়িয়ে নানা ফাঁক ফোঁকর দিয়ে, প্রয়োজনে সম্পূর্ণ নীতিহীনভাবে, শেয়ার মার্কেটকে ব্যবহার করে, বাঙ্কে লোন নিয়ে শোধ না দিয়ে উৎপাদনহীন পুঁজির পাহাড় তৈরি হয় এই ব্যবস্থায়। উইকিপিডিয়ার ভাষায়, "Finance capitalism is characterized by a predominance of the pursuit of profit from the purchase and sale of, or investment in, currencies and financial products such as bonds, stocks, futures and other derivatives." যদিও মার্ক্সের এই ধরনের পুঁজির পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে, তথাপি আজকের ফাইনান্স ক্যাপটালিজমের মোকাবিলা করতে সাবেকি কায়দা যথেষ্ট নাও হতে পারে।

যাই হোক, শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'-এর যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তা কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মত সংখ্যালঘুর স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না। বস্তুত সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব অর্থে পরসত্ত্বভোগী মুষ্টিমেয়র শাসনকে বোঝায় না, বরং বৃহত্তম মেহনতি জনসাধারণের নিজেদের গণতান্ত্রিক শাসনকে বোঝায়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাষ্ট্র সর্বদাই মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে তন্নিষ্ঠ শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত হয়। যেখানে গণতন্ত্র থাকলেও তা মুষ্টিমেয় জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বের যে সমাজতন্ত্র তাতে বৃহত্তম অংশের গণতন্ত্র স্বীকৃত হয়। মুষ্টিমেয় স্বার্থন্বেষী পরস্বভোগী অলস ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের স্বার্থ এখানে গুরুত্ব পায়। তাই সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চস্তর বলে মনে করা হয়। যাই হোক, এইরূপ রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এরূপ রাষ্ট্রে শ্রম-শোষণের কোন সুযোগ থাকে না। প্রত্যেকে তার শ্রমের অনুপাতে মজুরি পাবে। তবে সমাজতন্ত্রে 'যে কাজ করে না, সে খায়ও না'- এই নীতিতে চলে। শ্রেণি-শোষণের অবসান তথা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে

পরিচালিত এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের সাথে সাথে জনগণকে রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাধিকার প্রদান, জাতিগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ নির্মূলকরণ, নারীজাতির সত্যিকারের সমানাধিকার প্রদানে সদা নিয়োজিত থাকে।

পরিশেষে উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন সাম্যবাদী সমাজে (communism) রূপান্তরিত হবে তখন উৎপাদনের প্রাচুর্যের ফলে মানসিক ও দৈহিক শ্রমের পার্থক্য কমে আসবে। এই সমাজে ‘প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু পাবে’। স্পষ্টতই শ্রেণি-শোষণের অবসান ঘটার ফলে শোষণের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের তখন আর কোন প্রয়োজন থাকবে না, রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বিলোপ ঘটবে। একেই ‘withering away of the state’ বলা হয়ে থাকে।

এভাবে মার্কসবাদ আমাদের শেখাচ্ছে: (১) বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিছিন্ন করে কোন বিষয়কে বোঝা ঠিক নয়। (২) দারিদ্র, বৈষম্য ইত্যাদি বাস্তব বিষয়কে অবহেলা করা, বা দর্শনে অনুপযুক্ত বিচার করা অন্যায়। (৩) সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্যকে খেয়ালে রাখতে হবে।

মার্কসবাদের পর্যালোচনা

মার্কসবাদ এক মহান বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যা উদারনীতিবাদসহ বিপরীত মেরুর যাবতীয় চিন্তাকর্ম তথা সমাজ-ভাবনাকে গভীরভাবে আঘত করেছে, আলোড়িত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। আবার মার্কসবাদ যেহেতু বাস্তব জগতে প্রযোজ্য সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ তথা রাজনৈতিক দর্শন সেহেতু মার্কসবাদী তাত্ত্বিক তথা রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের মধ্যে বিস্তর আলাপ-আলোচনারও পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। যাই হোক, আমরা এখন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে উঠা প্রধান কয়েকটি অভিযোগ তথা সমালোচনার বিচার করব।

প্রথমত, মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (economic determinism)-এর অভিযোগ উঠেছে। মার্কস-এঙ্গেলস্ অর্থনীতির উপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে তাঁরা ভুলেই গেছেন যে “Man does not live by bread alone!”। লয়েড মন্তব্য করেছেন, সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ও ইতিহাসের অগ্রগমনে অর্থনীতির নির্ধারক ভূমিকা থাকলেও মনে রাখতে হবে যে মানুষ শুধুমাত্র রুজি-রুটি নিয়েই বাঁচতে পারে না। সমাজ-বিবর্তনে স্তরে স্তরে ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদানের ভূমিকাকে উপেক্ষা করায় মার্কসবাদ ভ্রান্তদর্শী বা অসম্পূর্ণ। মার্কসবাদীরা কি ভুলে গেলেন যে কোনো এক মহান ব্যক্তির সামাজিক সম্মান, মান-মর্যাদা তথা ক্যারিশ্মাও অনেক ক্ষেত্রে সমাজের উপর প্রভাব ফেলে!

প্রসঙ্গত ‘ইকোনমিক অ্যাণ্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুসক্রিপ্টস অফ্ ১৮৮৪’ থেকে কয়েকটি কথা বলা দরকারঃ এখানে উদরপূর্তি সহ জৈবিক কাজকর্ম ও তার জন্য উৎপাদনকে মানবিক কর্ম বলেছেন বটে, কিন্তু একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এগুলিই যদি মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেগুলি আর মানবিক না হয়ে হয়ে যায় জান্তব। আসলে মার্ক্স এখানে “উৎপাদন” শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছেন, বলছেন মানুষ শুধুই তার জৈবিক প্রয়োজনে উৎপাদন করে না, নন্দনতত্ত্বের আহ্বানে সে অনেক কিছু সৃষ্টি করে আপন খেয়ালে, যেখানে তার প্রজাতি-সত্তা প্রকাশ পায়।

এই সূত্রে আরও দুটি কথা বলা যায়। প্রথম কথা, মার্কস বা মার্কসবাদীরা ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শনের ভূমিকা, বা মহান ব্যক্তির গুরুত্বকে অস্বীকার করেন না। তবে তাঁরা মনে-প্রাণে মানেন যে খাদ্য-বাসস্থানের জৈবিক সমস্যা না মিটলে এসব মানবিকী চর্চা প্রকৃত অর্থে সার্থক হতে পারে না। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, মার্কস-এঙ্গেলস্ সমাজের ভিত্তি (base) এবং উপরিসৌধ (superstructure)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছে্ এবং স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে অর্থনীতি সমাজের প্রধান ভিত্তি হলেও ভিত্তি উপরিসৌধকে সম্পূর্ণ নির্ধারণ করতে পারে না। এঙ্গেলস্ বলেন, কোন অট্টালিকার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেমন তার ভিতের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না, তেমনি অর্থনীতির ভিত সমাজ ইতিহাসের সবকিছু চূড়ান্তভাবে স্থির করে দেয় না। তবে আমাদের অভিজ্ঞতাই এটা জানান দেয় অর্থনীতি, বিশেষ করে রাজনৈতিক অর্থনীতিই সমাজের প্রধান চালিকা শক্তি। দ্বিতীয় কথা, মার্কসবাদীরা ব্যক্তির ভূমিকা গণনা করেন না – এমন নয়। তবে, তাঁরা মনে করেন ব্যক্তি এককভাবে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, অপরাপর মানুষের সাহায্য ছাড়া কেউই মহান কিছু করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মার্কসবাদকে ‘জড়বাদী’ দর্শন বলে সমালোচনা করেন। তাঁরা বলতে চান, মার্কস নিষ্প্রাণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন জড় বস্তু (matter)-কেই একমাত্র চরম সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য সত্তাকে হয় অস্বীকার করেছেন, নয়তো রূপান্তরবাদীদের মতো জড়ে পর্যবসিত করে বুঝেছেন। আমাদের চেতনার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য তথা ভাব-জগতকে আলাদা করে স্বীকার না করায় ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদীরা একে ‘ভ্রান্ত দর্শন’ বলে অভিমত জানিয়েছেন।

এই অভিযোগের উত্তরে প্রথমেই যেটা বলার কথা তা হলো ‘জড়বাদ’ পরিভাষাটি এখানে বিভ্রান্তিকর। ‘জড়’ বলতে কোনরূপ সম্ভাবনাহীন নিশ্চল সত্তার কথা আমদের অনেকের মাথায় আসে। প্রাণবান প্রকৃতি তথা জীবজগত এই দর্শন-প্রস্থানের বাইরে চলে যায়। এখানে ‘বস্তুবাদ’ কথাটি তবু অনেক বেশি উপযুক্ত। আসলে বস্তুবাদের এলাকা জড়-জগত, উদ্ভিদ-জগত, প্রাণী-জগত, মানব-জগত-ইত্যাদি সব কিছু। মার্কস বস্তুবাদী। আধিবিদ্যক জড়বাদের ব্যাপারে তাঁর

আগ্রহ ছিল না। নিষ্প্রাণ, বিছিন্ন জড়কে নয়, তিনি গতিশীল বস্তুকে (matter-in-motion) জগতের প্রাথমিক উপাদান মেনেছেন।

আর একটা কথা, বহুকালের বহু অপপ্রচার ও অপব্যবহারের দরুন 'বস্তুবাদ' বলতে অনেকেই বোঝেনঃ 'খাও দাও স্ফূর্তি কর' মার্কা নিতান্ত ভোগবাদী জীবনদর্শন, যেখানে ঈশ্বর-আত্মা, পাপ-পুণ্য, নীতি-নৈতিকতা নেই; এক কথায়, জানোয়ারের মতো জীবনযাপনের খেলো ভাবধারা। কিন্তু ঘটনা হল, এই ভাবধারার সঙ্গে দার্শনিক বা মার্কসীয় অর্থে বস্তুবাদের কোন সম্পর্ক নেই। এই বস্তুবাদ আসলে প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের উৎস খোঁজার চেষ্টা করে বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিস্কারকে সামনে রেখে।

মার্কসও অনুরূপভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদী বিচারধারাকে, বস্তুর দ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, বস্তুরাজির মধ্যেকার শক্তি যেমন প্রকৃতি-জগতকে চালিত করে, তেমনি বৈষয়িক উপাদান ও উৎপাদন সম্পর্কগুলি আমাদের সমাজ-জীবনকে চালনা করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিমূর্ত দর্শন বা অধিবিদ্যায় মার্কসের আগ্রহ ছিল না। আগ্রহ ছিল না যান্ত্রিক বস্তুবাদে, যা মনে করে পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মেই সবকিছু চলে, বিকাশের বা পরিবর্তনের কোন গল্প নেই! তাঁর আগ্রহ ছিল এমন এক বিশ্ববীক্ষা তথা মতাদর্শের সূত্রপাত করা যা জগৎটাকে পাল্টাতে সাহায্য করতে পারে, উন্নততর সমাজ গঠনে সাহায্য করতে পারে। (আজকের ভাষায় যাকে আমরা 'ফলিত দর্শন' [applied philosophy] বলছি।) সেখানে তিনি গতিময় বস্তুকে মৌলিক উপাদান হিসেবে গণনা করেছেন, আর তৎসম্পর্কিত চিন্তাভাবনাকে অনুসারী গৌণ উপাদান বলেছেন। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি: "It is not consciousness of man that determines their existence but on the contrary their social existence that determines their consciousness." [*A Contribution to the Critique of Political Economy*]

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপাদানগুলি এখনে আমরা আর একবার গণনা করব: (১) সমাজজীবনে ভাব বা ধারণার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য তথা প্রাথমিকতার অস্বীকৃতি; (২) বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তনের বিরুদ্ধে মূর্ত ঘটনা তথা অনুসন্ধানের প্রতি পদ্ধতিতত্ত্বগত দায়বদ্ধতা; (৩) সমাজ-জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে মানবীয় কর্মাভ্যাসের কেন্দ্রিকতা (centrality of praxis); (৪) মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রকৃতির পরিবর্তন এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যস্থতায় ক্রিয়াশীল শ্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ; (৫) প্রজাতি-মানববাদ (species humanism)-এর প্রকৃতিবাদে আস্থা এবং (৬) প্রতিদিনকার বস্তুবাদ এবং পরবর্তী পর্যায়ে, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রতি দায়বদ্ধতা। এহেন বাস্তববাদী মতাদর্শকে পর্যবসানবাদী 'জড়বাদ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। মার্কস কখনই বলেন নি যে, এই জগতে জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই কেউ কেউ মন্তব্য

করেছেন, মার্কসীয় বস্তুবাদ দুর্বল অর্থে বস্তুবাদ এবং তা অ-পর্যবসানবাদী। মনে রাখতে হবে, চরম সত্তার পিছনে 'আমার সোনার হরিণ চাই' বলে ছুটে চলা সৌখিন দার্শনিকদের মতো তিনি বিমূর্ত অধিবিদ্যায় আগ্রহী নন, ফলিত সমাজ-দর্শনের সূচনা করাই তাঁর ব্রত।

অন্যভাবে বললে, মার্কসের এই পদ্ধতিতাত্ত্বিক বস্তুবাদ (১) ভাববাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে, বস্তু আগে, তার ভাব (বা ধারণা) পরে। এই অর্থে মানুষ যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবন নির্বাহ করে তাই তার বর্তমান অস্তিত্বের জন্য দায়ী, এবং এই উপাদানগুলির ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের বাস্তবিক চালিকা শক্তির কাজ করে। যেকোনো ধারণা গঠন বা চিন্তাভাবনা করার আগেই মানুষের মূর্ত অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় এই বস্তুবাদ। ভাববাদীরা, যারা জড় ও মনের মধ্যে অসেতুযোগ্য পার্থক্য করতে চায়, তাদের বিপরীতে গিয়ে বস্তুবাদীরা এই মূর্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকেই একমাত্র জগৎ বলে সিদ্ধান্ত করেন। (২) মানুষের সমাজের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন অতিজাগতিক সত্তার উল্লেখ বা অ-লৌকিক নিয়মনীতির প্রসঙ্গ না তুলে আমরা যা দেখি, যা শুনি, আমাদের যে মূর্ত অভিজ্ঞতা, তার উপরে দাঁড়িয়ে বস্তুবাদীরা জাগতকে ব্যাখ্যা করে, তার বিকাশের কথা বলে। (৩) বস্তুবাদের আশ্রয়বাক্যগুলি বৈজ্ঞানিক বিবৃতির সহগামী বলে যাচাইযোগ্য হয়। এহেন বস্তুবাদের বিরোধিতা করে সমাজকে বোঝা বা সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কি আদৌ সম্ভব?

তৃতীয়ত, অর্থনীতিবিদরা মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value)-এর যে তত্ত্ব তার সমালোচনা করে বলেন যে, মার্কস শুধু শ্রমকেই উৎপাদানের উপাদান হিসেবে গণনা করেছেন, অন্যান্য উপাদান, যেমন প্রযুক্তি, চাহিদা-যোগান ইত্যাদির গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতিগত এইসব উপাদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একদেশদর্শিতার এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির ভূমিকার বিচারের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটাই সমাজ-বিশ্লেষণের মূল চাবিকাঠি।

চতুর্থত, মার্কসবাদকে অনেক সময় শাশ্বত, অভ্রান্ত ও চিরন্তন বলে প্রচার করা হয়। সমালোচকদের বক্তব্য, জগতের নিত্য-নতুন পরিবর্তনের সাথে সাথে মতাদর্শেরও পরিবর্তন হয়। তাই যখন বলা হয়, "মার্কসবাদ অভ্রান্ত, কারণ তা সত্য" তখন তাঁরা স্বাভাবিক কারণে তার বিরোধিতা করেন। এর উত্তরে বলা যায়, মার্কসবাদের সত্যতার ধারণা কোন প্লেটোনিক বা হেগেলীয় সত্যতার ধারণা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্যের ধারণা। চিরন্তন সত্যের যে ধারণা আমরা সাবেকি অধিবিদ্যায় পাই, ধর্ম যে সনাতন সত্যের প্রচার করে তা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মনীতি যে অর্থে সত্য, সে অর্থে সমাজ-বিকাশের যে নিয়ম-নীতির মার্কস সন্ধান দিয়েছেন সেগুলিও সত্য। তবে প্রকৃতির জগতে বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতির ক্রিয়াশীলতা বা

তার প্রয়োগ যেখানে সরল, মানবীয় জগতের নিয়ম-নীতিগুলি প্রয়োগ তথা বাস্তবায়ন যেখানে অনেক বেশি জটিল। স্বাধীন মানুষের আচরণ পাথর-মৃত্তিকার আচরণের মতো স্থির বা একমুখী নয়। তাই সব সময় সমাজ-পরিবর্তনের নিয়ম-নীতিগুলি অবধারিত সার্থক হবে – এমন কথা নেই। কারণ আজকের বামপন্থী কবে তাৎক্ষণিক লাভালাভের হিসেব করে ডানদিকে ঘুরে যাবে তা কে জানে! কিন্তু তাতে সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতিগুলির মিথ্যাত্ব প্রমাণ হয় না। তবে এখানে যে কথাটি সত্য বলে কারোর আপত্তি নেই, তর্কাতীত ও ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, তা হল সমাজ কখন স্থির থাকে না, নিজস্ব নিয়মেই তা বদলাবে।

পঞ্চমত, আর একটি অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগাস্ট' ২৩-এ একটি কনফারেন্সে শুনলাম: শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজে পৌঁছে গেলে মার্ক্সবাদের আর কিছু করার থাকবে না; তাই এটি অসম্পূর্ণ দর্শন! এর উত্তরে বলবো, এঁনারা ভেবে নিচছেন যে একটি দর্শন এমন হবে যা এক নির্দিষ্ট সময়-কালে দাঁড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের সব সমস্যার পথ বাতলে দেবে! এটা ঘটনা যে দর্শনকে এভাবে 'সর্বরোগহর' বা বর্তমান স্থান-কালে দাঁড়িয়ে অতীত বর্তমান দূর ভবিষ্যতের সব প্রশ্নের উত্তরদানকারী শাস্ত্র হিসেবে দেখার ঐতিহ্য আছে, যদিও তা অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। অতীত বর্তমান ও সুদূর ভবিষ্যতের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে চূড়ান্ত ভাববাদী কিছু দার্শনিক! এ প্রসঙ্গে আরও বলার, কমিউনিস্ট সমাজ শেষ কথা, আর পরিবর্তন হবে না - এই ভাবনাও মার্কসীয় নয়। পরিবর্তনের অনিবার্যতা তো মার্কসবাদই অস্বীকার করতে পারে না!

ষষ্ঠত, পিটার সিঙ্গার সম্প্রতি প্রকাশিত "**মার্কস: এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন**" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১) পুস্তিকায় সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী বিষয়ে অভিযোগ তুলেছেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎবাণী গুলি মেলেনি। এই ভবিষ্যৎবাণী গুলি মোটামুটি এরূপ ছিলঃ (১) শিল্পোন্নত দেশেই প্রথম প্রোলেতারিয়েতে বিপ্লব সংঘটিত হবে। (২) পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য ক্রমশ বাড়বে। (৩) শ্রমিকদের মজুরি কম-বেশি ন্যূনতম অস্তিত্বের স্তর (subsistence level)-এ রয়ে যাবে। (৪) পুঁজিপতিদের অনেকেই সর্বহারা শ্রেণি তে রূপান্তরিত হবে, সারা বিশ্বে মাত্র কয়েকজন পুঁজিপতি রাজ করবে। (৫) পুঁজিবাদ নিজের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার ফলে একদিন আপনা-আপনি ভেঙে পড়বে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে মার্কস একজন বড়ো দার্শনিক হতে পারেন, সমাজবিজ্ঞানী নন!

বলা বাহুল্য, প্রথম পর্যায়ের শিল্প উন্নত দেশ ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স বা আমেরিকায় সমাজ বিপ্লব ঘটেনি, রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন বৈপ্লবিক বা গুণগত পার্থক্য ঘটেনি। বিপরীতে রাশিয়া, চীনের মতো শিল্পে পিছিয়ে থাকা কৃষি-প্রধান দেশেই প্রোলেতারিয়েত বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। এখানে একটা কথা বলার এবং তা হল, মার্কস কথিত নিয়ম-নীতিগুলি আপনাআপনি কাজ করে

তা কিন্তু নয়। সমাজ-বিকাশের বস্তুগত কারণ উপস্থিত থাকলেও বিষয়ীগত কারণ, যেমন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-চেতনা স্তর ইত্যাদি হাজারো বিষয় ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। রাশিয়া, চীনে বিষয়ীগত শর্ত গুলো এতটাই পরিপক্কতা লাভ করেছিল যে বিষয়গত সত্যের বিকাশের অভাব প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেনি। বিপরীতে ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানির ক্ষেত্রে বিষয়ীগত উপাদান পরিপক্কতা লাভ করেনি বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের আয়ের পার্থক্য সম্পর্কে একটি কথা: পুঁজিবাদের বাড়-বাড়ন্তের সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণির আয়ও কিছুটা বেড়েছে। এর কারণ সম্ভবত কমিউনিজমের যে আগ্রাসী প্রকাশ্য প্রচার তা তাদের কর্মপন্থায় কিছু পরিবর্তন আনতে, শ্রমিকদের কল্যাণে কিছু খরচ করতে বাধ্য করেছে। তবে এটিও সত্য পুঁজির পাহাড় যেভাবে বেড়েছে শ্রমিকের শ্রম-মূল্য সেভাবে বাড়েনি। ন্যূনতম অস্তিত্বের স্তর যে সর্বত্র অতিক্রম করা গেছে তাও নয়।

তৃতীয়ত, বিশ্বের বৃহৎ পুঁজিপতির সংখ্যা কমেছে সত্য, কিন্তু অনেক পুঁজিপতি শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে- এমনটি নয়। পুঁজির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সমাজকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা আপনা-আপনি ভেঙ্গে পড়বে। বিষয়ীগত শর্তগুলির অপরিপক্কতা এখানে কারণ হতে পারে। আবার বিষয়গত তথা জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে অনুকূল শর্তের অনুপস্থিতি স্থিতাবস্থার পক্ষে কাজ করতে পারে। তাছাড়া, মার্কস-পরবর্তী যুগে বিভিন্ন দেশে যে প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে শাসক শ্রেণি সেখানে সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণে বেশ কিছু আপাত মধুর পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, যা স্থিতাবস্থার পক্ষে কাজ করে।

প্রসঙ্গত, আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে মের্টন (Robert K Merton) তাঁর একটি প্রবন্ধ “The Self-fulfilling Prophecy”- (**দ্য অ্যান্টিয়ক রিভিউ**, ভ্যলুম ৮, সংখ্যা ২, ১৯৪৮)-তে এই মর্মে যুক্তি দিয়েছেন যে কোন একটি ভবিষ্যৎবাণী ঘটে-উঠার সঙ্গে তার সত্য হওয়ার কোন সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। যেমন, কোন একটি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাবে-এই মিথ্যা গুজবেই ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। গুজবটা সত্যি হতে যাচ্ছে ভেবে সকল গ্রাহক টাকা সেখান থেকে সরিয়ে নিতে পারে। মার্কস বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিপ্লব হবে। হলোও কয়েকটি দেশে, যদিও যেগুলি ঠিক ধনতন্ত্রে উন্নত দেশ নয়। মের্টন বলেন, এতে প্রমাণ হয় না মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী সত্য ছিল না। ধনতন্ত্রে অনুন্নত যে সব দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেখানে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করে বিশাল সংখ্যায় মানুষ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কাজে লেগে পড়েছিল। এরূপ এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি ইতিহাসকে পরিবর্তনের পথে চালিত করে। অন্য দেশগুলিতে মানুষজন এটাতে বিশ্বাস রাখে নি, উদ্যোগী হয়নি, তাই সেখানে বিপ্লব ঘটেনি।

মের্টনের মতে, ভবিষ্যৎবাণী স্ব-সাধিত হতে পারে, আবার স্ব-বাধিতও হতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশের পরিচালক-মণ্ডলীর এক বড় সংখ্যক মানুষ মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী যাতে বাস্তবায়িত না হয় তার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। তারা ভবিষ্যত ঘটনা-প্রবাহের বিরুদ্ধে কাজ করে সেটাকে রোধ করার চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী তাই স্ব-বাধিত হয়েছে বলা যায়। আসলে কোন ভবিষ্যৎবাণী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য হলেও সেটা ঘটনা হিসেবে নাও ঘটে উঠতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি, মার্কসের বিপ্লব-চিন্তা সত্য হলেও ঘটনায় তা সবসময় সত্য হয়ে ওঠেনি। তার মানে এই নয় তা ভবিষ্যতে সত্য হবে না।

ষষ্ঠত, মার্কস সমাজকে প্রধানত বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে – এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, এই দুই শ্রেণি ছাড়া সমাজের অনেক মধ্যসত্ত্বভোগী বা মধ্যবর্তী শ্রেণি আছে (যেমন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, দালাল, ঠিকাদার) যাদের পুঁজিপতি বা শ্রমিক-কোন একটি শ্রেণি তে ঠিক যেমন ফেলা যায় না। আবার শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থা তথা অর্থনীতির ভাষায় শ্রেণি-বিভাজন সর্বাংশে সত্য নয়। সমাজে অনেক মানুষ আছেন, যারা মান-সম্মানে অনেক বড়, বা নাগরিক সমাজ তথা ধর্মীয় অনুষঙ্গের কারণে তিনি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা বা ক্ষমতা ভোগ করে থাকতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমত কথা যেটা বলার তা হল মার্কসবাদীরা পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির বাইরে এদের মধ্যবর্তী এক শ্রেণি পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির কথা বলেছেন, যার মধ্যে কথিত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে এত বিভিন্ন ধরনের কর্ম-বিভাগ ঘটেছে যে তাদের শ্রেণি-চরিত্র নির্ধারণ করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। এখানে বিষয়গত শর্ত, অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা নিরিখে অবস্থান বিচার করার থেকে বিষয়ীগত শর্তের উপর, ব্যক্তির শ্রেণি-চেতনার উপর বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা। তবে জটিলতা স্বীকার করে নিয়েও এটা বলা যায় শ্রেণি-চরিত্র নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিষয়গত শর্ত হিসেবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্ক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড স্বীকার করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে শ্রমিক শ্রেণির যে কমিউনিস্ট পার্টি তার দায়িত্ব মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার, এবং সমাজ বিপ্লবে তাদের সাথী করার।

সপ্তমত, মার্কসবাদ শ্রেণি সংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে, সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলে। মার্কস ভুলে গেছেন যে ইতিহাসে যেমন বিরোধ-সংঘাতের আছে তেমনি প্রেম-প্রীতির সহযোগিতা আছে। এই একদেশদর্শিতা মার্কসবাদকে ‘অসম্পূর্ণ’ প্রতিপন্ন করে। এর প্রতিক্রিয়ায় বলা যায়, মার্কসবাদীরা মানুষে মানুষে সহযোগিতার সার্থক সম্পর্ককে কখনও অস্বীকার করেন না। বরং প্রকৃত অর্থে শ্রেণি-সচেতন জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু শোষক পুঁজিপতির সঙ্গে শোষিত শ্রমিকের সত্যিকারের

সহযোগিতা, প্রেম-প্রীতি বাস্তবে কিভাবে সম্ভব? উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকলে, শ্রম-শোষণ অব্যাহত থাকলে শ্রেণিদ্বন্দ্ব থাকবেই। ধনী পুঁজিপতি স্বেচ্ছায় সবকিছু বিনা যুদ্ধে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে ইতিহাসে এরকম নজির নেই। যদি ব্যতিক্রমী কোন ঘটনা ঘটেও থাকে, তা রাষ্ট্র-কাঠামোয় আমূল কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি। আর একটা কথা, রাষ্ট্রবিপ্লব কতখানি সংঘর্ষময় বা রক্তাক্ত হবে তা শাসক শ্রেণির প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। বিপ্লব ঘটাকালীন পরিস্থিতিই এইসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। তবে যত কম রক্তক্ষয় হবে ততই মঙ্গল। বিপরীতে, যারা কেবল অহিংসার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন, তাঁরা কাল্পনিক জগতে বাস করছেন, তাদের ভাবনা ঠিক ইতিহাস-সম্মত নয়।

অষ্টমত, শ্রেণি-সংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে মার্কসবাদীরা একটু বেশি আশাবাদী। কিন্তু শ্রেণি-সংগ্রামের ফলে আবশ্যিকভাবে সর্বহারা শ্রেণিই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে, শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে উঠবে-এরূপ আনুভূমিক বিশ্লেষণ যথার্থ নয়। মাঝপথে কোন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটবে না, বা নতুন কোন সুবিধাভোগী শ্রেণির উদ্ভব ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? ঠিকই। এ আশঙ্কা একেবারে যে অমূলক তা নয়। তবে ইতিহাসের বস্তুবাদী তথা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই সমাজতন্ত্রের কথা উঠেছে। উত্তরণের পক্ষে বিষয়গত ও বিষয়ীগত নানা শর্ত আছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আছে- এসব কিছুকে শ্রমিক শ্রেণি যদি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, নেতৃত্বে যদি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি থাকে, তাহলে শ্রেণি-সংগ্রাম সফল না হওয়ার কারণ নেই। তবে এই উত্তরণ প্রাথমিকভাবে যতটা সহজ সরল মনে হয় বাস্তবে তা অনেক অনেক কঠিন ও জটিল।

নবমত, মার্কস-এঙ্গেলস্ রাষ্ট্রকে শ্রেণি-স্বার্থের ধারক-বাহক বলে মনে করেছেন-এক ক্ষুদ্র শ্রেণি কর্তৃক সংখ্যাগুরুর শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন-এই বিচার সর্বাংশে সত্য নয়। কল্যাণকামী প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র-কাঠামো ধারণা কি তাহলে অর্থহীন? এই সমালোচনা মিথ্যা নয়, আজকের দুনিয়ায় আমরা অনেক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সন্ধান পাই। কিন্তু জনগণের জন্য কিছু ছাড় বা ভর্তুকির জন্য বা রূপশ্রী ভাতার ব্যবস্থা করার জন্য মার্কস রাষ্ট্রনীতি বা সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতি সূত্রবদ্ধ করেন নি, মানবতার চরম বিজয় ঘটানোর লক্ষ্যে, শোষণহীন সমাজগঠনের লক্ষ্যে মার্কসবাদের মতাদর্শ রচিত হয়েছে, যা উদারনীতিবাদী বা কল্যাণকামী অর্থনীতিতে সম্ভব বলে এখনো পর্যন্ত তেমন কোন প্রমাণ নেই।

দশমত, ক্ষমতা-লিপ্সা, লোভ, হিংসা, দ্বেষাদি চারিত্র্য-দৌর্বল্য কমিউনিস্ট অ-কমিউনিস্ট সকলের মধ্যেই কাজ করে। তাই সর্বহারার একনায়কতন্ত্র যে সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের সূচনা করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? ইতিহাস আমাদের কিছু কমিউনিস্ট নেতা তথা রাষ্ট্রনায়ক উপহার

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.01

দিয়েছে যাদের চরিত্রে এ ধরনের সংশয় দেখা গেছে। উত্তরে বলা যায়, কমিউনিস্ট হতে গেলে অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলার কাজ ব্যক্তিগতস্তরে ও সাংগঠনিক স্তরে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় সদা-সর্বদা। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত করতে হয় অ-কমিউনিস্টসুলভ ভাবনা তথা মতাদর্শকে নির্মূল করার জন্য।

প্রসঙ্গত আরো কয়েকটি কথা :

(ক) অনেকে মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। অভিযোগটি সত্য নয়। বরং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মতো প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রকাঠামো গুটিকতক ধনী পুঁজিপতি ও অন্যভাবে শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে কাজ করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে সীমিত হতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তবে যদি কেউ ব্যক্তি বলতে সহ-নাগরিকদের সঙ্গে সম্বন্ধহীন স্বার্থপর ব্যক্তিকে বোঝান তাহলে কিছু বলার নেই।

(খ) প্রসঙ্গত আর এক জন সমালোচকের প্রসঙ্গ না তুললে এই পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এবং তিনি হলেন ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা, যিনি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক সোভিয়েতের পতনের ঠিক পরের বছরই 'দ্য এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান' লিখে সমাজ-পরিবর্তনের পথে শেষ দাঁড়ি টেনে দিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ও চিরস্থিতির 'নিদান' হেঁকে দিলেন! অবশ্য জ্যাক দেরিদা, নোয়াম চমস্কি, স্লাভক জিজেক প্রমুখ চিন্তকদের সমালোচনা ও দক্ষিণ আমেরিকার নূতন নূতন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং মৌলবাদের দৌরাত্ম্য তাঁকে বাধ্য করেছে শেষ নিদান ফিরিয়ে নিতে। এঁরা কম্যুনিজম-বিরোধী প্রচারদলের সদস্য, এঁরা মার্কসবাদের পদ্ধতি-প্রকরণ জেনেবুঝে, বা না বুঝে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এসব কথা বলছেন – একথা মেনে নিয়েও আমার একটা কথা বলার আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজকের মানুষের কাছে স্বতঃসত্য বলে মনে হয়, সেখানে বাজারের ভূমিকাকে একবারে বাদ দেওয়া যায় কি? অন্তত কিছু নিয়ন্ত্রণ রেখে বাজারকে উন্মুক্ত রাখলে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে আর একটু স্বীকৃতি জানানো যায় না কি!

(গ) মার্কসবাদ মানুষের স্থায়ী বা পূর্বনির্ধারিত সারধর্মের সাবেকি ভষ্যে বিশ্বাস করে না। প্রজাতি হিসেবে মানুষের কিছু স্থায়ী বৈশিষ্ট্য থাকতেই পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেইসব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সে পূর্বনির্ধারিত। মানুষের যে সামাজিক অস্তিত্ব তাই তার সত্তাকে প্রকারান্তরে নির্ধারণ করে। আর সামাজিক ব্যবস্থা যেহেতু পরিবর্তনশীল সেহেতু মানুষের প্রকৃতি চিরন্তন বা স্থির কিছু নয়। পুঁজিবাদী সমাজের একজন মানুষ কমিউনিস্ট সমাজের একজন মানুষ থেকে আলাদা হবে। তবে তিনি সার্বিক মানবতার কোন ধারাণা বা বিশ্বাস না থাকলে সার্থক মানব মুক্তির কথা বলা যায় কি? মার্কস তাঁর ১৮৪৪-এর ম্যানুস্ক্রিপ্টস্-এ মানুষের প্রজাতি-বৈশিষ্ট্যের

কথা বলেছেন, যা এক ধরনের মানবতাবাদকে ইঙ্গিত করেঃ “To say that man raises himself above his own subjective individuality that he recognizes in himself the objective universal and thereby transcends himself as finite being.”

(ঘ) কেউ কেউ স্তালিন, কিম সুং প্রমুখ কয়েকজন বিতর্কিত নেতার কথা তুলে মন্তব্য করেন, মার্কসবাদ একনায়কতন্ত্রে শেষ হয়! এই প্রসঙ্গে বলার, মার্কসবাদীরা দল তথা গোষ্ঠী নেতৃত্বে আগ্রহী, তাই বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি যদি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে তাহলে ব্যক্তি-একনায়কের সামানে আসার সুযোগ কম। সাবধানতার সঙ্গে পার্টির নেতৃত্ব যদি দল ও সরকার পরিচালনা করে, জনগণ যদি সজাগ থাকে তাহলে ব্যক্তি-একনায়কের সামানে আসার সুযোগ থাকার কথা নয়। আর একটি কথা, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠের সার্বিক নেতৃত্বকে বোঝায়, হিটলারীয় একনায়কতন্ত্র নয় কিন্তু।

(ঙ) সমাজতন্ত্র সবসময় সবধরনের পুঁজির বিরোধিতা করে না (যদিও প্রাথমিক বিচারে পুঁজিকে সমাজতন্ত্রের আন্টি-থিসিস বলে মনে হয়)। পুঁজির নিয়ন্ত্রণ এক বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকবে, নাকি সংখ্যা-গরিষ্ঠের সার্বিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকবে-এটাই মূল প্রশ্ন তাঁদের কাছে। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পুঁজির ব্যবহার করার বিরোধী নয়, বর্তমান চিন যার প্রমাণ। অবশ্য তখন ‘পুঁজি’ কথাটির সাবেকি তাৎপর্য (‘ধনের ধর্মই অসাম্য’!) হয়ত কিছুটা ম্লান হয়।

(চ) মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র শোষকের বিপক্ষে যায় বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। একথা ঠিক যে শোষককে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ঘটানোই মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শোষককে হত্যা করায় তাদের উদ্দেশ্য। অন্যায় ভাবে স্তূপীকৃত পুঁজির নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেই কোন হিংসার প্রশ্ন নেই! আর মার্কস তাঁর আত্ম-বিচ্যুতিতত্ত্বে দেখিয়েছেন যে শোষক পুঁজিপতিও তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত। তবে এই বিচ্যুতির অর্থ শোষকের কাছে এক রকম আর শোষিতের কাছে আর একরকম। সত্যিকারের মানুষ হতে উভয়কেই আত্ম-বিচ্যুতির কারণগুলিকে অতিক্রম করতে হবে।

(ছ) উত্তর-আধুনিক চিন্তকেরা মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মহা-আখ্যান (grand narrative) এর বিরোধিতা করে বলেন, খণ্ড খণ্ড আখ্যানই সত্য। তাঁরা স্থান-কাল-পাত্রের বিশেষত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। তাঁদের আভিযোগ, সার্বিক তথা সমগ্রতাবাদী নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারণা ও নিয়ম-নীতির ভাষায় মার্কসবাদ প্রাকৃতিক জগত, সমাজ জীবন ও তাদের অগ্রগমন, ইতিহাস, অথনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদি সব কিছু ব্যাখ্যা করে যা অনেক সময় মূর্ত বাস্তবতাকে ধরতে পারে না। অন্যদিকে, উত্তর-মার্কসবাদ নামে আর এক ধারার চিন্তকগণও শ্রেণি সংগ্রাম, সর্বহারার বিপ্লবের এসবের বিপরীতে এই ধরনের খণ্ড খণ্ড আখ্যানের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তবে সমস্যা হল, উত্তর-আধুনিক চিন্তকদের এই খণ্ড খণ্ড আখ্যান কোন সংহত

বিকল্পের সন্ধান দিতে পারে না। তবে আমাদের মনে হয়, লিঙ্গ, জাতি/পরিচিতি সত্তা ইত্যাদি বৈষম্যের কিছু খণ্ড আখ্যানকে মার্কসবাদে অন্তরভূক্ত করতে কোন বাধা নেই।

বলা বাহুল্য, মার্কসবাদের যে রাজনৈতিক মতাদর্শ, যে মানব মুক্তির দর্শন তার গুরুত্ব এসব সমালোচনার মাধ্যমে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। বরং এগুলি এটাই ইঙ্গিত করে যে মার্কসবাদের অনুশীলনে আরো যত্নবান হওয়া, আরো বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদের মৌলিক নিয়ম-নীতিগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে অবিরত অধ্যয়ন ও অনুশীলনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পশ্চাৎগামিতাকে মার্কসবাদের কোন মৌলিক ভ্রান্তি বা এর অসম্ভ্যবতাকে সপ্রমাণ করে না। বরং আরও পুঁজিতন্ত্র সম্পর্কে বেশী সাবধানী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে আরও জনমুখী হতে শিক্ষা দেয়।

আর মার্কসবাদকে নিছক বদ্ধতন্ত্র (closed system) হিসেবে না দেখে অন্তর্ভুক্তিবাদ (inclusivism)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বাঞ্ছনীয়, পদ্ধতি (method) হিসেবে দেখা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে, জাত-পাত ও পরিচিতি প্রশ্নে শতধা-বিভক্ত ভারতীয় সমাজে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শ্রেণি-ধারণার সঙ্গে মেলানোর প্রশ্ন রয়েছে। তবে তা করতে গিয়ে মার্কসবাদের মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লে চলবে না। আর কর্মসূচির স্থির করতে গিয়ে আজকের পুঁজিবাদের বিশ্বায়িত চরিত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আজকের মানুষের আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা: মার্কস-এঙ্গেলসের যে সব লেখাপ্ত্র সাবেকি সোভিয়েত ইউনয়নের মূলত সরকারী সৌজন্যে প্রকাশিত হয়েছে তা ‘নির্বাচিত’ রচনাবলী মাত্র। সাম্প্রতিক কালে Marx-Engels-Gesamteausgabe [MEGA] গবেষণা-প্রকল্প এই প্রথম ১১৪ খণ্ডে তাঁদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে (যার মধ্যে জুলাই ‘২৩ পর্যন্ত ৬২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে)। আমরা আশা করছি, তাঁদের সব লেখাপত্র (ঠিক যেমন ঠিক সেভাবে) প্রকাশ পেলে মার্কসবাদের আরও নূতন নূতন দিগন্ত খুলে যাবে, অনেক না-পাওয়া উত্তরও পাওয়া যাবে। পরিশেষে বলি, মার্কসবাদ যেহেতু বিজ্ঞান সেহেতু তাকে বদ্ধ তন্ত্র বানিয়ে না রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্ব তাকে নিষ্ঠার অনুশীলন করতে হবে, যাতে করে এই ‘মর্ত্যলোকেই স্বর্গ’ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় কোনদিন।

তথ্যসূত্র [মার্কস-এঙ্গেলসের মূল রচনা এবং উল্লেখিত তথ্যসমূহের অতিরিক্ত]

১. সুদীপ্ত কবিরাজ: মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান, কলকাতা: অনুস্টুপ, ২০২২
২. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: দ্বন্দ্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, কলকাতা: অবভাস, ২০২১

৩. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা, কলকাতা: অবভাস, ২০১৯
৪. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা, কলকাতা: অবভাস, ২০১৮
৫. হারুণ রশীদ: মার্কসীয় দর্শন, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪
৬. শোভনলাল দত্তগুপ্ত: রাষ্ট্রচিন্তা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১